এক

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।
—রাখালী গান

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও— মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া।

এ-গাঁও যেন ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে!
মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।
এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হতে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে!
কেউবা বলে— আদ্যিকালের এই গাঁর এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসি;
এ-পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ওই গাঁয়ে,
ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর-পরা পায়ে!

এই খানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।
কেইবা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ!
বুকে তাহার এ-গাঁর ও-গাঁর হরেক রঙের পাখি,
মিলায় সেথা নূতন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁর পাখি এ-গাঁও পানে ধায়,
ও-গাঁর পাখি এ-গাঁয় আসে বনের কাজল-ছায়।
এ-গাঁর লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁর লোকও আসে
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর— শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁয় ও-গাঁয় নাইক কোন ফাঁক।
ও-গাঁর বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁয় এসে লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে!
এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
কাইজা[1] ফ্যাসাদ্[2] করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ-গাঁও, ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীঘল বাট;
দুই পাশে তার ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ-গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও-গাঁয় যাওয়ার ভেলা।

১। কাইজ্জা= মারামারি   ২। ফ্যাসাদ = ঝগড়া

দুই

এক কালা দাতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,
—ও কালা, ঘরে রইতে দিলি না আমারে।
—মুর্শিদা গান

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষী,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কোলো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান্ করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী-বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল[1] লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

তিন

চন্দনের বিন্দু বিন্দু কাজলের ফোঁটা
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর ছটা
—মুর্শিদা গান

ওই গাঁখানি কালো কালো, তারি হেলান দিয়ে,
ঘরখানি যে দাঁড়িয়ে হাসে ছোনের ছানি নিয়ে;
সেইখানি এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু[১] বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা[২]।
লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।
মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
ফুল ঝর-ঝর জন্তি গাছে জড়িয়ে কেবা শাড়ী,
আদর করে রেখেছে আজ চাষীদের ওই বাড়ী।
যে ফুল ফোটে সোনের খেতে, ফোটে কদম গাছে,
সকল ফুলের ঝলমল গা-ভরি তার নাচে।

১। সাজু— পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো জেলায় বাপের বাড়িতে মুসলমান মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকা হয়। বড় মেয়েকে বড়, মেঝ মেয়েকে মাজু, সেজ মেয়েকে সাজু এইভাবে ডাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকে কিন্তু এ নামে ডাকিতে পারে না।

২। গোনা = পাপ

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।
গাঁদাফুলের রঙ দেখেছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি ?
রামধনুকে না দেখিলে কি-ই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ-টুবাণী[১], নাইক দেখার লোভ।
দেখেছি এই চাষীর মেয়ের সহজ গেঁয়ো রূপ,
তুলসী-ফুলের মঞ্জরী কি দেব-দেউলের ধূপ !
দু-একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে,
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা বয়ে !
পড়ুশীরা কয় — মেয়ে ত নয়, হল্‌দে পাখির ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

এমন মেয়ে — বাবা ত'নেই, কেবল আছেন মা;
গাঁওবাসীরা তাই বলে তায় কম জানিত না।
তাহার মতন চেকন 'সেওই' কে কাটিতে পারে,
নক্‌সী করা 'পাকান পিঠায়' সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিকেয় তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।
বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
"সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে" —বলে কি লোক সাধে ?

চার

কানা দেয়ারে, তুই না আমার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক[১] দে, চিনার ভাত খাই।

— মেঘরাজার গান

চৈত্র গেল ভীষণ খরায়[২], বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।
ডোলের বেছন[৩] ডোলে চাষীর, বয় না গরু হালে,
লাঙল জোয়াল ধুলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।
কাঠ-ফাটা রোদ মাঠ বাটা বাট আগুন লয়ে খেলে,
বাউকুড়াণী[৪] উড়ছে তারি ঘূর্ণী ধূলি মেলে।
মাঠখানি আজ শূনো খাঁ খাঁ, পথ যেতে দম আঁটে,
জন্-মানবের নাইক সাড়া কোথাও মাঠের বাটে;
শুক্‌নো চেলা কাঠের মত শুক্‌নো মাঠের ঢেলা,
আগুন পেলেই জ্বলবে সেথায় জাহান্নামের[৫] খেলা।
দর্‌গা তলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভারে;
নৈলা গানের[৬] ঝঙ্কারে গাঁও কান্‌ছে বারে বারে।
তবুও গাঁয়ে নামল না জল, গগনখানা ফাঁকা;
নিঠুর নীলের বক্ষে আগুন করছে যেন খাঁ খাঁ।

১। ডলক=বৃষ্টি। ২। খরায়=গরমে। ৩। বেছন=বীজ।
৪। বাউকুড়াণী=ঘূর্ণিবায়ু। ৫। জাহান্নাম=নরক।
৬। নৈলা গান=বৃষ্টি নামাইবার জন্য চাষীরা এই গান গাহিয়া থাকে।

উচ্চে ডাকে বাজপক্ষি 'আজরাইলে'র ডাক,
'খর-দরজাল'[১] আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক !

এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে,
গুটি কয়েক আস্‌ল মেয়ে এই না গাঁয়ের পানে।
আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে পাঁচটি রঙে ফুল,
মাঝের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল।
মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,
তেল-হলুদে কানায় কানায় করছে ছলাৎ ছল।
মেয়ের দলে বেড়িয়ে তারে চিকন সুরের গানে,
গাঁয়ের পথে যায় যে বলে বদনা-বিয়ের মানে।
ছেলের দলে পড়ল সাড়া, বউরা মিঠে হাসে,
বদনা-বিয়ের গান শুনিতে সবাই ছুটে আসে।
পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি,
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।
এ-বাড়ি যায় ও-বাড়ি যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রাম-শালিকের ছা।

কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো !
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই !

১। খর-দরজাল=প্রলয়ের দিনে ইনি বেহেস্ত ও দোযখ মাথায় করিয়া আসিবেন। খাড়া দর্জাল।

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব, মোদের হলে বিয়া !
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায় !

'দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।
ঘরের লাঙল ঘরে রইল, হাইলা চাষা রইদি মইল;
দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে ঢলিয়া পড়।
ঘরের গরু ঘরে রইল, ডোলের বেছন ডোলে রইল;
দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।'

বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চল্‌ল তারা মাগুন হাঁকি হাঁকি।
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউবা দিল আনি।
এমনি ভাবে সবার ঘরে মাগুন করি সারা,
রূপাই মিঞার রুশাই-ঘরের[১] সামনে এল তারা।
রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়,
পাঁচটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায় !
পাঁচটি মেয়ে, গান যে গায়, গানের মতই লাগে,
একটি মেয়ের সুর ত নয় ও বাঁশী বাজায় আগে।

১। রুশাই-ঘরের = রন্ধন শালার

ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চালন ভালো,
পাঁচটি মেয়ের রূপ হয়েছে ওরির রূপে আলো।

রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান,
রূপাই বলে, "এই দিলে মা থাকবে না আর মান।"
ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনা মুগের ডাল।
মাগন সেরে মেয়ের দল চল্‌ল এখন বাড়ি,
মাঝের মেয়ের মাথার বোঝা লাগছে যেন ভারি।
বোঝার ভারে চলতে নারে, পিছন ফিরে চায় :
রূপার দুচোখ বিঁধিল গিয়ে সোনার চোখে হায়।

পাঁচ

লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন
— ময়মনসিংহ গীতিকা

আশ্বিনেতে ঝড় হাঁকিল, বাও ডাকিল জোরে,
গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝাপট লট্‌পটা সব করে।
রূপার বাড়ির রুশাই-ঘরের ছুটল চালের ছানি,
গোয়াল ঘরের খাম[১] থুয়ে তার চাল যে নিল টানি।

ওগাঁর বাঁশ দশটা টাকায়, সে গাঁয় টাকায় তেরো,
মধ্যে আছে জলীর বিল কিইবা তাহে গেরো[২]।
বাঁশ কাটিতে চল্‌ল রূপাই কোঁচায় বেঁধে চিঁড়া,
দুপুর বেলায় খায় যেন সে—মায় দিয়াছে কিরা।
মাজায় গোঁজা রাম-কাটারী চক্‌চকাচক্‌ ধার,
কাঁধে রঙিন গামছাখানি দুলছে যেন হার।

মোল্লা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপগুলি নয় বড়;
খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।
সর্ব্বশেষে পছন্দ হয় শেখের বাড়ির বাঁশ;
ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।

১। খাম = থাম ২। গেরো=বাধা

বাঁশ কাটিতে যেয়ে রূপাই মারল বাঁশে দা,
তল দিয়ে যায় কাদের মেয়ে —হলদে পাখির ছা !
বাঁশ কাটিতে বাঁশের আগায় লাগল বাঁশের বাড়ি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে তার প্রাণ বুঝি যায় ছাড়ি।
লম্বা বাঁশের লম্বা যে ফাঁপ, আগায় বসে টিয়া,
চাষীদের ওই সোনার মেয়ে কে করিবে বিয়া !
বাঁশ কাটিতে এসে রূপাই কাটল বুকের চাম,
বাঁশের গায়ে বসে রূপাই তুল্‌ল নিজের কাম।
ওই মেয়ে ত তাদের গাঁয়ে বদনা-বিয়ের গানে,
নিয়েছিল প্রাণ কেড়ে তার চিকন সুরের দানে।

"খড়ি[১] কুড়াও সোনার মেয়ে ! শুক্‌নো গাছের ডাল,
শুক্‌নো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আখার জ্বাল।
শুক্‌নো খড়ি কুড়াও মেয়ে ! কোমল হাতে লাগে,
তোমায় যারা পাঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে ?"
এমনিতর কত কথাই উঠে রূপার মনে,
লজ্জাতে সে হয় যে রঙিন পাছে বা কেউ শোনে।
মেয়েটিও ডাগর চোখে চেয়ে তাহার পানে,
কি কথা সে ভাবল মনে সেই জানে তার মানে !

এমন সময় পিছন হতে তাহার মায়ে ডাকে,
"ওলো সাজু ! আয় দেখি তোর নথ বেঁধে দেই নাকে !
ওমা ! ও কে বেগান[২] মানুষ বসে বাঁশের ঝাড়ে !"
মাথায় দিয়ে ঘোমটা টানি দেখছে বারে বারে।

১। খড়ি = জ্বালানী কাঠ।   ২। বেগান=পর।

খানিক পরে ঘোমটা খুলে হাসিয়া এক গাল,
বলল, "ও কে, রূপাই নাকি ? বাঁচবি বহু কাল !
আমি যে তোর হইরে খালা', জানিসনে তুই বুঝি ?
মোল্লা-বাড়ির বড়্‌রে তোর মার কাছে নিস্ খুঁজি।
তোর মা আমার খেলার দোসর — যাক্‌গে ওসব কথা,
এই দুপুরে বাঁশ কাটিয়া খাবি এখন কোথা ?"

রূপাই বলে, "মা দিয়েছেন কোঁচায় বেঁধে চিঁড়া"
"ওমা ! ও তুই বলিস কিরে ? মুখখানা তোর ফিরা !
আমি হেথা থাকতে খালা, তুই থাকবি ভুখে,
শুনলে পরে তোর মা মোরে দুষবে কত রুখে !
ও সাজু, তুই বড় মোরগ ধরগে যেয়ে বাড়ি,
ওই গাঁ হতে আমি এদিক দুধ আনি এক হাঁড়ি।"

চল্‌ল সাজু বাড়ির দিকে, মা গেল ওই পাড়া।
বাঁশ কাটিতে রূপাই এদিক মারল বাঁশে নাড়া।
বাঁশ কাটিতে রূপার বুকে ফেটে বেরোয় গান,
নলী বাঁশের বাঁশীতে কে মারছে যেন টান !
বেছে বেছে কাটল রূপাই ওড়া-বাঁশের গোড়া,
তল্লা-বাঁশের কাটল আগা, কালধোয়ানির জোড়া;
বাল্‌কে কাটে আল্‌কে কাটে কঞ্চি কাটে শত,
ওদিক বসে রূপার খালা রান্ধে মনের মত।

সাজু ডাকে তলা থেকে, "রূপা-ভাইগো এসো"
—এই কথাটি বলতে তাহার লজ্জারো নাই শেষও।
লাজের ভারে হয়তো মেয়ে যেতেই পারে পড়ে,
রূপাই ভাবে হাত দুখানি হঠাৎ যেয়ে ধরে।

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরা জল দিয়ে আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।
খেতে খেতে রূপাই কেবল খালার তারিফ করে,
"অনেক দিনই এমন ছালুন[১] খাইনি কারো ঘরে।"
খালায় বলে "আমি ত নয় রেঁধেছে তোর বোনে,"
লাজে সাজুর ইচ্ছা করে লুকায় আঁচল-কোণে।
এমনি নানা কথায় রূপার আহার হল সারা,
সন্ধ্যা বেলায় চল্‌ল ঘরে মাথায় বাঁশের ভারা।

খালার বাড়ির এত খাওয়া, তবুও তার মুখ,
দেখলে মনে হয় যে সেথা অনেক লেখা দুখ।
ঘরে যখন ফিরল রূপা লাগল তাহার মনে,
কি যেন তার হয়েছে আজ বাঁশ কাটিতে বনে।
মা বলিল, "বাছারে, কেন মলিন মুখে চাও ?"
রূপাই কহে, "বাঁশ কাটিতে হারিয়ে এলেম দাও[২]।"

ছয়

ও তুই ঘরে রইতে দিলি না আমারে।

— রাখালী গান

ঘরেতে রূপার মন টেকে না যে, তরলা বাঁশীর পারা,
কোন্ বাতাসেতে ভেসে যেতে চায় হইয়া আপন হারা।
কে যেন তাহার মনের তরীরে ভাটির করুণ তানে,
ভাটিয়াল সোঁতে ভাসাইয়া নেয় কোন্ সে ভাটার পানে।
সেই চিরকেলে গান আজও গাহে, সুরখানি তার ধরি,
বিগানা গাঁয়ের বিরহিয়া মেয়ে বেয়ে আসে যেন তরী !
আপনার গানে আপনার প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়,
তবু সেই ব্যথা ভাল লাগে যেন, একই গান পুনঃ গায়।
খেত-খামারে মন বসেনাকো; কাজে কামে নাই ছিরি,
মনের তাহার কি যে হল আজ ভাবে তাই ফিরি ফিরি।
গানের আসরে যায় না রূপাই সাথীরা অবাক মানে,
সারাদিন বসি কি যে ভাবে তার অর্থ সে নিজে জানে !
সময়ের খাওয়া অসময়ে খায়, উপোসীও কভু থাকে,
"দিন দিন তোর কি হল রূপাই" বার বার মায় ডাকে।
গেলে কোনখানে হয়ত সেথাই কেটে যায় সারাদিন,
বসিলে উঠেনা উঠিলে বসেনা, ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
সবে হাটে যায় পথ বরাবর রূপা যায় ঘুরে বাঁকা,
শালার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশ-পাতা দিয়ে ঢাকা।

পায়ে-পায় ছাই বাঁশ-পাতাগুলো মচ্ মচ্ করে বাজে;
কেউ সাথে নেই, তবু যে রূপাই মরে যায় যেন লাজে।
চোরের মতন পথে যেতে যেতে এদিক ওদিক চায়,
যদিবা হঠাৎ সেই মেয়েটির দুটি চোখে চোখ যায়।
ফিরিবার পথে খালার বাড়ির নিকটে আসিয়া তার,
কত কাজ পড়ে, কি করে রূপাই দেরি না করিয়া আর।

কোনদিন কহে, "খালামা, তোমার জ্বর নাকি হইয়াছে,
ও-বাড়ির ওই কানাই আজিকে বলেছে আমার কাছে।
বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসেরখানি গজা;"
"বালাই ! বালাই ! জ্বর হবে কেন ? রূপাই করিলি মজা;
জ্বর হলে কিরে গজা খায় কেহ ?" হেসে কয় তার খালা,
"গজা খায়নাক, যা হোক এখন কিনে ত হইল জ্বালা;
আচ্ছা না হয় সাজুই খাইবে।" ঠেকে ঠেকে রূপা কহে,
সাজু যে তখন লাজে মরে যায়, মাথা নীচু করে রহে।

কোন দিন কহে, "সাজু কই ওরে, শোনো কিবা মজা, খালা !
আজকের হাটে কুড়ায়ে পেয়েছি দুগাছি পুঁতির মালা;
এক ছোঁড়া কয়, 'রাঙা সূতো' নেবে ? লাগিবে না কোন দাম;
নিলে কিবা ক্ষতি, এই ভেবে আমি হাত পেতে লইলাম।
এখন ভাবছি, এসব লইয়া কিবা হবে মোর কাজ,
ঘরেতে থাকিলে ছোট বোনটি সে ইহাতে করিত সাজ।
সাজু ত আমার বোনেরই মতন, তারেই না দিয়ে যাই,
ঘরে ফিরে যেতে একটু ঘুরিয়া এ-পথে আইনু তাই।"

এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি অরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনে-সূতী মালা দিয়া।

এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ,
বিভোল কুমার, বিভোল কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।
—তারা বুঝল না, পাড়ার লোকেরা বুঝিল অনেকখানি,
এখানে ওখানে ছেলে বুড়ো মিলে শুরু হল কানাকানি।

সেদিন রূপাই হাট-ফেরা পথে আসিল খালার বাড়ি,
খালা তার আজ কথা কয়নাক, মুখখানি যেন হাঁড়ি।
"রূপা ভাই এলে ?" এই বলে সাজু কাছে আসছিল তাই,
মায় কয়, "ওরে ধাড়ী মেয়ে, তোর লজ্জা শরম নাই ?"
চুল ধরে তারে গুড়ুম গুড়ুম মারিল দু'তিন কিল,
বুঝিল রূপাই এই পথে কোন হইয়াছে গরমিল।

মাথার বোঝাটি না-নামায়ে রূপা যেতেছিল পথ ধরি,
সাজুর মায়ে যে ডাকিল তাহারে হাতের ইশারা করি;
"শোন বাছা কই, লোকের মুখেতে এমন তেমন শুনি,
ঘরে আছে মোর বাড়ন্ত মেয়ে জ্বলন্ত এ আগুনি।
তুমি বাপু আর এ-বাড়ি এসো না।" খালা বলে রোষে রোষে,
"কে কি বলে ? তার ঘাড় ভেঙে-দেব !" রূপা কহে দম কসে।
"ও-সবে আমার কাজ নাই বাপু, সোজা কথা ভালবাসি,
সারা গাঁয়ে আজ ঢি ঢি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুল-নাশী।"

সাজুর মায়ের কথাগুলি যেন বঁড়শীর মত বাঁকা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে দিয়ে যায় তীব্র বিষের ধাকা।
কে যেন বাঁশের জোড়-কঞ্চিতে তাহার কোমল পিঠে,
মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।
টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁর পথ ধরি,
সম্মুখ হতে জোনাকীর আলো দুই পাশে যায় সরি।

রাতের আঁধার গলি ভরা বিষে জমাট বেঁধেছে বুঝি,
দুই হাতে তাহা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে রূপা পথ খুঁজি।
মাথার ধামায় এখনও রয়েছে দুজোড়া রেশমী চুড়ি,
দুপায়ে তাহারে দলিয়া রূপাই ভাঙিয়া করিল গুঁড়ি।
হাটের সদাই[১] জলীর বিলেতে দুহাতে ছুঁড়িয়া ফেলি,
পথ থুয়ে রূপা বেপথে চলিল, ইটা খেতে[২] পাও মেলি।
চলিয়া চলিয়া মধ্য মাঠেতে বসিয়া কাঁদিল কত,
অষ্টমী চাঁদ হেলিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।

প্রভাতে রূপাই উঠিল যখন মায়ের বিছানা হতে,
চেহারা তাহার আধা হয়ে গেছে চেনা যায় কোন মতে।
মা বলে, "রূপাই কি হলরে তোর ?" রূপাই কহে না কথা
দুখিনী মায়ের পরাণে আজিকে উঠিল দ্বিগুণ ব্যথা।
সাত নয় মার পাঁচ নয় এক রূপাই নয়ন তারা,
এমনি তাহার দশা দেখে মায় ভাবিয়া হইল সারা।
শানাল[৩] পীরের সিন্নি মানিল খেতে দিল পড়া-পানি,
দেহের দৈন্য দেখিল জননী, দেখিল না প্রাণখানি।
সারা গায়ে মাতা হাত বুলাইল চোখে-মুখে দিল জল,
বুঝিল না মাতা বুকের ব্যথার বাড়ে যে ইহাতে বল।

আজকে রূপার সকলি আঁধার, বাড়া-ভাতে ওড়ে ছাই,
কলঙ্ক কথা সবে জানিয়াছে, কেহ বুঝি বাকি নাই।
জেনেছে আকাশ; জেনেছে বাতাস, জেনেছে বনের তরু;
উদাস-দৃষ্টি যত দিকে চাহে সব যেন শূনো মরু।

১। সদাই=সওদা। ২। ইটা খেত=চষা খেত।
৩। শানাল=পূর্ব বঙ্গের বিখ্যাত পীর শাহলাল।

চারিদিক হতে উঠিতেছে সুর, ধিক্কার ! ধিক্কার !!
শাখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার।
ব্যথায় ব্যথায় দিন কেটে গেল, আসিল ব্যথার সাঁজ,
পূবে কলঙ্কী কালো রাত এল, চরণে ঝিঁঝির ঝাঁজ !
অনেক সুখের দুখের সাক্ষী বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে,
বসিল রূপাই বাড়ির সামনে মধ্য মাঠেতে গিয়ে।

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি ?
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়;
যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশীতে কেমন দেখাব তায় ?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে;
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব ? তবুও মাটিতে কান;
পেতে রহি যদি কভু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ !
মোরা জানি খোঁজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
রাজা-বাদশার সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়েছি কথার মেলা।
পল্লীর কোলে নির্ব্বাসিত এ ভাইবোনগুলো হায়,
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়;
তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল,
কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল ?
—সে বন-বিহগ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদনাই।

বাজায় রূপাই বাঁশীটি বাজায় মনের মতন করে,
যে ব্যথা বুকে ধরিতে পারেনি সে ব্যথা বাঁশীতে ঝরে।

'আমি কেনে বা পিরীতিরে করলাম।
(আমার ভাবতে জনম গেলরে,
আমার কানতে জনম গেলরে।)
সে ত সীত্তার সিন্দুর নয় তারে আমি কপালে পরিব,
সে ত ধান নয় চাউল নয় তারে আমি ডোলেতে ভরিবরে,
আমি কেনেবা পিরীতিরে করলাম।
আগে যদি জানতাম আমি প্রেমের এত জ্বালা,
ঘর করতাম কদম্বতলা, রহিতাম একেলারে;
আমি কেনেবা পিরীতিরে করলাম।'
— মুর্শিদা গান

বাজে বাঁশী বাজে, তারি সাথে সাথে দুলিছে সাঁজের আলো;
নাচে তালে তালে জোনাকীর হারে কালো মেঘে রাত-কালো।
বাজাইল বাঁশী ভাটিয়ালী সুরে বাজাল উদাস সুরে,
সুর হতে সুর ব্যথা তার যেন চলে যায় কোন্ দূরে !
আপনার ভাবে বিভোল পরাণ, অনন্ত মেঘ-লোকে,
বাঁশী হতে সুরে ভেসে যায় যেন, দেখে রূপা দুই চোখে।
সেই সুর বেয়ে চলেছে তরুণী, আউলা মাথার চুল,
শিথিল দুখান বাহু বাড়াইয়া ছিঁড়িছে মালার ফুল।
রাঙা ভাল্ হতে যতই মুছিছে ততই সিঁদুর জ্বলে;
কখনও সে মেয়ে আগে আগে চলে, কখনও বা পাছে চলে।
খানিক চলিয়া থামিল তরুণী আঁচলে ঢাকিয়া চোখ,
মুছিতে মুছিতে মুছিতে পারে না, কি যেন অসহ শোক !
করুণ তাহার করুণ কান্না আকাশ ছাইয়া যায়,
কি যেন মোহের রঙ ভাসে মেঘে তাহার বেদন-ঘায়।

পুনরায় যেন খিলখিল করে একগাল হাসি হাসে,
তারি ঢেউ লাগি গগনে গগনে তড়িতের রেখা ভাসে।

কখনও আকাশ ভীষণ আঁধার, সব গ্রাসিয়াছে রাহু,
মহাশূন্যের মাঝে ভেসে উঠে যেন দুইখানি বাহু !
দোলে — দোলে বাহু তারি সাথে যেন দোলে — দোলে কত কথা,
"ঘরে ফিরে যাও মোর তরে তুমি সহিও না আর ব্যথা।"
মুহূর্ত্ত পরে সেই বাহু যেন শূন্যে মিলায় হায় —
রামধনু বেয়ে কে আসে ও মেয়ে, দেখে যেন চেনা যায় !
হাসি হাসি মুখ গলিয়া গলিয়া হাসি যায় যেন পড়ে,
সারা গায়ে তার রূপ ধরেনাক, পড়িছে আঁচল ঝরে।
কণ্ঠে তাহার মালার গন্ধে বাতাস পাগল পারা,
পায়ে রিনি ঝিনি সোনার নূপুর বাজিয়া হইছে সারা;

হঠাৎ কে এলো ভীষণ দস্যু—ধরি তার চুল মুঠি,
কোন্ আন্ধার গ্রহপথ বেয়ে শূন্যে সে গেল উঠি।
বাঁশী ফেলে দিয়ে ডাক ছেড়ে রূপা আকাশের পানে চায়,
আধা চাঁদখানি পড়িছে হেলিয়া সাজুদের ওই গাঁয়।
শুনো মাঠে রূপা গড়াগড়ি যায়, সারা গায়ে ধূলো মাখে,
দেহেরে ঢাকিছে ধূলো মাটি দিয়ে, ব্যথারে কি দিয়ে ঢাকে !

সাত

'ঘটক চলিল চলিল সূর্য সিংহের বাড়িরে।'

— আসমান সিংহের গান

কান্‌-কানা-কান্‌ ছুটল কথা গুন্‌-গুনা-গুন্‌ তানে,
শোন্‌-শোনা-শোন্‌ সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।
"কি করগো রূপার মাতা ? খাইছ কানের মাথা ?
ও-দিক যে তোর রূপার নামে রটছে গাঁয়ে যা তা !
আমরা বলি রূপাই এমন সোনার-কলি ছেলে,
তার নামে হয় এমন কথা দেখব কি কাল গেলে ?"
এই বলিয়া বড়াই বুড়ী বসল বেড়ি দোর,
রূপার মা কয়, "বুঝিনে বোন কি তোর কথার ঘোর !"
বুড়ী যেন আচমকা হায় আকাশ হতে পড়ে,
"সবাই জানে তুই না জানিস যে কথা তোর ঘরে ?"
ও-পাড়ার ও ডাগর ছুঁড়ী, শেখের বাড়ির 'সাজু',
তারে নাকি তোর ছেলে সে গড়িয়ে দেছে বাজু।
ঢাকাই শাড়ী কিন্যা দিছে, হাঁসলী দিছে নাকি,
এত করে এখন কেন শাদীর রাখিস বাকি ?"
রূপার মা কয়, "রূপা আমার এক-রত্তি ছেলে,
আজও তাহার মুখ শুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।
তার নামে যে এমন কথা রটায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
সে যেন তার বেটার মাথা চিবায় ন্যাড়ি যায়ে।"

রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ,
একটু দিলে তামাক পাতা, নিলেন বুড়ী শ্বাস।
এমন সময় ওই গাঁ হতে আসল খেঁদির মাতা,
টুনির ফুপু[১] আসল হাতে ডল্‌তে তামাক পাতা।
ক'জনকে আর থামিয়ে রাখে? বুঝল রূপার মা;
রূপা তাহার সত্যি করেই এতটুকুন না।
বুঝল মায়ে কেন ছেলে এমন উদাস পারা,
হেথায় হোথায় কেবল ঘোরে হয়ে আপন হারা।
ওপাড়ার ও দুখাই মিঞা ঘটকালিতে পাকা,
সাজুর সাথেই জুড়ুক বিয়ে যতকে লাগুক টাকা।

শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকী-বেড়ার কাছে,
দাঁড়িয়ে বলে, "সাজুর মাগো, একটু কথা আছে।"
সাজুর মায়ে বসতে তারে এনে দিলেন পিঁড়ে,
ডাব্বা হুঁকা লাগিয়ে বলে, আস্তে টান ধীরে।"
ঘটক বলে, 'সাজুর মাগো মেয়ে তোমার বড়,
বিয়ের বয়স হলো এখন ভাবনা কিছু কর।'
সাজুর মা কয় "তোমরা আছ ময়-মুরব্বি ভাই,
মেয়ে মানুষ অত শত বুঝি কি আর ছাই!
তোমরা যা কও ঠেলতে কি আর সাধ্য আছে মোর?"

ঘটক বলে, "এই ত কথা, লাগবে না আর ঘোর।'
ও-পাড়ার ও রূপারে ত চেনই তুমি বোন্‌,
তার সাথে দাও মেয়ের বিয়ে ঠিক করিয়ে মন।"
সাজুর মা কয়, "জান ত ভাই! রটছে গাঁয়ে যা তা,
রূপার সাথে বিয়ে দিলে থাকবে না আর মাথা।"

১। ফুপু = পিসী, বাপের বোন।

ঘটক বলে, "কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা,
নিন্দা যারা করে তাদের পড়বে মুখে ঝাঁটা।
রূপা ত আর নয় এ গাঁয়ে যেমন তেমন ছেলে,
লক্ষ্মীরে দেই বউ বানায়ে অমন জামাই পেলে।"
ঠাটে ঘটক কয় গো কথা ঠোঁট-ভরাভর হাসে;
সাজুর মায়ের পরাণ তারি জোয়ার-জলে ভাসে।
"দশ খান্দা জমি রূপার, তিনটি গরু হালে,
ধানের-বেড়ী ঠেকে তাহার বড় ঘরের চালে।
সাজু তোমার মেয়ে যেমন, রূপাও ছেলে তেমন,
সাত গেরামের ঘটক আমি জোড় দেখিনি এমন।"

তার পরেতে পাড়্‌ল ঘটক রূপার কুলের কথা,
রূপার দাদার[১] নাম শুনে লোক কাঁপত যথা তথা।
রূপার নানা সোয়েদ-ঘেঁষা, মিঞাই বলা যায় —
কাজী বাড়ির প্যায়দা ছিল কাজল-তলার গাঁয়।
রূপার বাপের রাখত খাতির গাঁয়ের চৌকিদারে,
আসেন বসেন মুখের কথা — গান বাজিত তারে।
রূপার চাচা অছিমদ্দী, নাম শোন নি তার ?
ইংরেজী তার বোল শুনিলে সব মানিত হার।
কথা ঘটক বল্‌ল এঁটে, বল্‌ল কখন ঢিলে,
সাজুর মায়ে সবগুলি তার ফেল্‌ল যেন গিলে।

মুখ দেখে তার বুঝল ঘটক — লাগছে ওষুধ হাড়ে,
বল্‌ল "তোমার সাজুর বিয়া ঠিক কর এই বারে।"
সাজুর মা কয়, "যা বোঝ ভাই, তোমরা গ্যা তাই কর,
দেখো যেন কথার আবার হয় না নড়চড়।"

১। দাদা = ঠাকুরদাদা।

"আউ ছিছি !" ঘটক বলে, "শোনই কথা বোন,
তোমার সাজুর বিয়া দিতে লাগ্‌বে কত পণ ?
পোণে দিব স্বুড়ি দেড়েক বায়না দেব তেরো,
চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় এই গে ধরো বারো।
সবদ্যা[১] হল দুই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন,
চাইলে বেশী জামাইর তোমার বেজার হবে মন।"
সাজুর মা কয়, "ও-সব কথার কি-ইবা আমি জানি,
তোমরা যা কও তাইত খোদার শুকুর বলে মানি।"
সাধে বলে দুখাই ঘটক ঘটকালিতে পাকা,
আদ্য মধ্য বিয়ের কথা সব করিল ফাঁকা।

চল্‌-চলা-চল্‌ চল্‌ল দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্‌-ধিনা-ধিন্‌ নাচে যেন গুন্‌গুনা গান করি।
দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি,
বুড়ো বটের শিকড় যেন চল্‌ছে নাড়ি নাড়ি;
লম্ফে লম্ফে চলে ঘটক দম্ভ করে চায়,
লুটের মহল দখল করে চলছে যেন গাঁয় !
ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্‌-ঝনা-ঝন্‌ বাজে,
হন্‌-হনা-হন্‌ চল্‌ল ঘটক একলা পথের মাঝে।
ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া, ডাইনে ঘন পাট,
জলীর বিলে নাও বাঁধিয়া ধর্‌ল গাঁয়ের বাট।
"কি কর গো রূপার মাতা, ভাবছ বসি কিবা,
সাজুর সাথেই ঠিক কইরাছি তোমার ছেলের বিবা[২]।
সহজে কি হয় সে রাজি, একশ টাকা পণ,
এর কমেতে বসেইনাক সাজুর মায়ের মন।

১। সবদ্যা=সব দিয়া ২। বিবা=বিবাহ।

আমিও আবার কুড়ি তিনেক উঠিয়ে তার পরে,
সাজুর মায়ও নাছোড়-বান্দা, দিলাম তখন ধরে;
আরেক কুড়ি, তয়[১] সে কথা কইল হাসি হাসি,
আমি ভাবি, বিয়ার বুঝি বাজ্‌ল সানাই বাঁশী।
এখন বলি, রূপার মাতা, আড়াই কুড়ি টাকা,
মোর কাছেতে দিবা, কথা হয় না যেন ফাঁকা !
আস্‌ব দিয়ে গোপনে তায়, নইলে গাঁয়ের লোকে,
মেজবানী[২] দাও বলে তারে ধরবে চীনে-জোঁকে।
বিয়ের দিনে নিবে সে তাই তিরিশ টাকা যেচে,
যারে তারে বল্‌তে পার এই কথাটি নেচে।
চিনি সন্দেশ আগোড় বাগোড় তার লাগিবে ষোলো,
এই ধরগ্যা রূপার বিয়া আজই যেন হল।"

রূপার মায়ের আহ্লাদে প্রাণ ধরেইনাক আর,
ইচ্ছা করে নেচে নেচে বেড়ায় বারে বার।
"ও রূপা, তুই কোথায় গেলি ? ভাবিস্‌নাক মোটে,
কপাল গুণে বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে !"
এই বলিয়া রূপার মাতা ছুটল গাঁয়ের পানে,
ঘটক গেল নিজের বাড়ি গুন্‌-গুনা-গুন গানে।

১। তয়=তবে।

২। মেজবানী=নিমন্ত্রণ দেওয়া।

আট

"কি কর দুল্যাপের মালো: বিভাবনায় বসিয়া,
আসত্যাছে বেটীর দামান ফুল পাগড়ী উড়ায়া নারে।"
"আসুক আসুক বেটীর দামান কিছুর চিন্তা নাইরে,
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাঙা পাটী নারে।
সেই ঘরেতে নাগায়া থুইছি মোমের সস্র[১] বাতি,
বাইর বাড়ি বান্দিয়া থুইছি গজমতী হাতী নারে।"

— মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,
কাছারী ঘর গুম্-গুমা-গুম্, লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি;
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প-গানে মাতি।
কেতাব পড়ার উঠল তুফান;—চম্পা কালু গাজী,
মামুদ হানিফ সোনাবান ও জয়গুণ বিবি আজি;
সবাই মিলে ফিরছে যেন হাত ধরাধর করি,
কেতাব পড়ার সুরে সুরে চরণ ধরি ধরি।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি।

কৌতূহলী গাঁয়ের লোকে শুনছে পেতে কান,
জুমজুমেরি[২] পানি যেন করছে তারা পান!

১। সস্র=সহস্র ২। জুমজুম=আরবের একটি পবিত্র কুপ।

দেখছে কখন মনের সুখে মামুদ হানিফ যায়,
লাল ঘোড়া তার উড়্‌ছে যেন লাল পাখিটির প্রায়।
কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়ছে যেন সুন্দর-বুনো বাঘ।
স্বপন দেখে, জয়গুন বিবি পালঙ্কেতে শুয়ে,
মেঘের বরণ চুলগুলি তার পড়ছে এসে ভূঁয়ে;
আকাশেরি চাঁদ সুরুজে মুখ দেখে পায় লাজ,
সেই কনেরে চোখের কাছে দেখ্‌ছে চাষী আজ।
দেখ্‌ছে চোখে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরে,
রক্ত যাহার জম্‌ছে আজো সন্ধ্যা-মেঘের গোরে;
কারবালারি ময়দানে সে ব্যথার উপাখ্যান;
সারা গাঁয়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।

উঠান পরে হল্লা-করে পাড়ার ছেলে মেয়ে
রঙিন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।
কানা-ঘুষা করত যারা রূপার স্বভাব নিয়ে,
ঘোর কলিকাল দেখে যাদের কানত সদা হিয়ে;
তারাই এখন বিয়ের কাজে ফির্‌ছে সবার আগে,
ভাঙা-গড়ার সকল কাজেই তাদের সমান লাগে।
বউ-ঝিরা সব রান্না-বাড়ায় ব্যস্ত সকল ক্ষণ;
সারা বাড়ি আনন্দ আজ খুশী সবার মন।
বাহিরে আজ এই যে আমোদ দেখ্‌ছে জনে জনে;
ইহার চেয়ে দ্বিগুণ আমোদ উঠ্‌ছে রূপার মনে।
ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার 'জোড়া জামা' গায়,
তেল-কুচ্‌-কুচ্‌ কালো রঙে ঝলক্‌ দিয়ে যায়।

বউ-ঝিয়া সব ঘরের বেড়ায় খানিক করে ফাঁক,
নতুন দুলার[১] রূপ দেখি আজ চক্ষে মারে তাক।

এমন সময় শোর উঠিল—বিয়ের যোগাড় কর,
জল্‌দি করে দুলার মুখে পান শরবত ধর[২]।
সাজুর মামা খট্‌কা লাগায়, "বিয়ের কিছু গৌণ,
সাদার পাতা[৩] আনেনি তাই বেজার সবার মন।"
রূপার মামা লম্ফে দাঁড়ায় দম্ভে চলে বাড়ি;
সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা আন্‌ল তাড়াতাড়ি।
কনের খালু[৪] উঠিয়া বলে "সিঁদুর হল উনা।"
রূপার খালু আনিয়া দিল যা লাগে তার দুনা!

কনের চাচার মন উঠে না, "খাটো হয়েছে শাড়ী।"
রূপার চাচা দিল তখন 'ইংরেজী বোল ছাড়ি'।
'কিরে বেটা বকিস নাকি?" কনের চাচা হাঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।
"কোথায় গেলি ছদন চাচা, ছমির শেখের নাতি,
দেখিয়ে দেই দুলার চাচার কতই বুকের ছাতি!
বেরো বেটা নওশা[৫] নিয়ে, দিব না আজ বিয়া;"
বলতে যেন আগুন ছোটে চোখ দুটি তার দিয়া।

১। দুলা=বর।
২। পান শরবত ধর=বিবাহের আগে বরকে পান শরবত খাওয়ান হয়।
৩। সাদার পাতা=তামাক পাতা।
৪। খালু= মেশোমশায়। ৫। নওশা=বর।

বরপক্ষের লোকগুলি সব আর যে বরের চাচা,
পালিয়ে যেতে খুঁজছে যেন রশুই ঘরের মাচা।

মোড়ল এসে কনের চাচায় অনেক করে বলে,
থামিয়ে তারে বিয়ের কথা পাড়েন কুতূহলে।
কনের চাচা বসল এসে বরের চাচার কাছে,
কে বলে ঝড় এদের মাঝে হয়েছে যে পাছে !
মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল[১] ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর-ভোজনী বাকি !
তার মাঝেতে এমন-তেমন হয়নি কিছু গোল,
কেবল একটি বিষয় নিয়ে উঠল হাসির রোল।
এয়োরা সব ক্ষীর ছোঁয়ায়ে কনের ঠোঁটের কাছে:
সে ক্ষীর আবার ধরল যখন রূপার ঠোঁটের পাছে;
রূপা তখন ফেলল খেয়ে ঠোঁট-ছোঁয়া সেই ক্ষীর,
হাসির তুফান উঠল নেড়ে মেয়ের দলের ভীড়।
ভাবল রূপাই — ওমন ঠোঁটে যে ক্ষীর গেছে ছুঁয়ে,
দোজখ যাবে না খেয়ে তা ফেলবে যে জন ভূঁয়ে।

১। সাক্ষী উকিল = মুসলমানদের বিবাহের সময় বর-কন্যা একস্থানে থাকে না। কন্যা-পক্ষের একজন উকিল এবং দুইজন সাক্ষী থাকেন। তাঁহারা বাড়ির ভিতরে যাইয়া বিবাহে কন্যার মত আছে কিনা জানিয়া আসেন। উকিল জিজ্ঞাসা করেন, সাক্ষীরা তাহা শুনিয়া আসিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় বিবাহ সভার সকলকে বলেন।

নয়

মৎস্য চেনে গহিন গঙ্গ পঙ্খী চেনে ডাল:
মায় সে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল !
নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ :
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

— গাজীর গান

আষাঢ় মাসে রূপার মায়ে মরল বিকার জ্বরে,
রূপা সাজু খায়নি খানা সাত আটদিন ধরে।
লালন পালন যে করিত 'ঠোঁটের' আধার দিয়া,
সেই মা আজি মরে রূপার ভাঙল সুখের হিয়া।
ঘামলে পরে যে তাহারে করত আবের পাখা;
সেই শ্বাশুড়ী মরে, সাজুর সব হইল ফাঁকা।
সাজু রূপা দুই জনেতে কান্দে গলাগলি;
গাছের পাতা যায় যে ঝরে, ফুলের ভাঙে কলি।
এত দুখের দিনও তাদের আস্তে হল গত,
আবার তারা সুখেরি ঘর বাঁধল মনের মত।

দশ

বড় ঘর বান্দাছাও মোনাভাই বড় করছাও আশা
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খী ছাড়বে বাসা।
— মুর্শীদা গান

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহ কাজে,
দুইখান হতে দুটি সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে।
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে,
দুইখানে রহি দুইজন আজি বুঝিছে ইহার মানে।

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হল্‌দি-কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদ বরণ ধানে।

আজকে রূপার বড় কাজ — কাজ — কোন অবসর নাই,
মাঠে যেই ধান ধরেনাক আজি ঘরে দেবে তারে ঠাঁই।
সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে ছড়াছড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি।

আজকে রূপার মনে পড়েনাক শাপলার লতা দিয়ে,
নয়া গৃহিণীর খোঁপা বেঁধে দিত চুলগুলি তার নিয়ে।
সিঁদুর লইয়া মান হয়নাক বাজে না বাঁশের বাঁশী,
শুধু কাজ—কাজ, কি যাদু-মন্ত্র ধানেরা পড়িছে আসি।
সারাটি বরষা কে কবি বসিয়া বেঁধেছে ধানের গান,
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী করিয়া সে অবসান।
আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা,
ছুটে গেঁয়ো পাখি ফিঙে বুলবুল তারি গানে হয়ে হারা।
কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;
এত কাজ তবু হাসি ধরেনাক, মুখে ফুল ফুটো ফুটো !
আজকে তাহার পাড়া-বেড়ানর অবসর মোটে নাই,
পার খাড়ু গাছি কোথা পড়ে আছে, কেবা খোঁজ রাখে ছাই !

অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা।
দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি,
ঢেকির পারেতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ি।
কোন দিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।
হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রান হয়ে ডুবে যায় রাতারাতি।

এমনি করিয়া ধানের কাব্য হইয়া আসিল সারা,
গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটা কৃষাণ পাড়া !
রাতেরে উহারা মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে,
বাঁশী বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে নতুন মানে।

আজিকে রূপার কোন কাজ নাই, ঘুম হতে যেন জাগি,
শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী তাহারই ব্যথার ভাগী।
সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি,
ঘুম হতে তারে সবে জাগায়েছে অরুণ-আলোয় সাজি।
নতুন করিয়া আজিকে উহারা চাহিছে এ ওর পানে,
দীর্ঘ কাজের অবসর যেন কহিছে নতুন মানে !
নতুন চাষার নতুন চাষাণী নতুন বেঁধেছে ঘর,
সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়বড় !
বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরেছিল, এত দিন পরে আজ,
তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।
সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি !

ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
"পায়ে পড়ি ওগো চলো শুতে যাই, ভাল লাগেনাক আর।"
রূপা ত সে কথা শোনেইনি যেন, বাঁশী বাজে সুরে সুরে,
'ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।'
বউ রাগ করে, "দেখ, বলে রাখি, ভাল হবেনাক পরে,
কালকের মত করি যদি তবে দেখিও মজাটি করে।
ওমনি করিয়া সরারাত আজি বাজাইবে যদি বাঁশী,
সিঁদুর আজিকে পরিব না ভালে, কাজল হইবে বাসি।
দেখ, কথা শোন, নইলে এখনি খুলিব কানের দুল,
আজকে ত আমি খোঁপা বাঁধিব না, আলগা রহিবে চুল।"

বেচারী রূপাই বাঁশী বাজাইতে এমনি অত্যাচার,
কৃষাণের ছেলে ! অত কিবা বোঝে, তখনই মানিল হার।

কহে জোড় করে, "শোন গো হুজুর, অধম বাঁশীর প্রতি,
মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।
আজকে ও-ভালে সিঁদুর দিবে না, খুলিবে কানের দুল,
সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের—ভোরে হাসিবে না ফুল !
এত বড় কথা ! আচ্ছা দেখাই, ওরে ও অধম বাঁশী,
এই তরুণীর অধরের গানে তোমার হইবে ফাঁসী।"

হাতে লয়ে বাঁশী বাজাইল রূপা মাঠের চিকন সুরে,
কভু দোলাইয়া বউটির ঠোঁটে কভু তারে ঘুরে ঘুরে।
বউটি যেন গো হেসে হয়রান, কহে ঠোঁটে ঠোঁট চাপি,
"বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজাল সেই পাপী ?"
পুনঃ জোর করে রূপা কহে, "এই অধমের অপরাধ,
ভয়ানক যদি, দণ্ড তাহার কিছু কম নিতে সাধ !"
রূপার বলার এমনি ভঙ্গী বউ হেসে কুটি কুটি,
কখনও পড়িছে মাটিতে ঢলিয়া, কভু গায়ে পড়ে লুটি।
পরে কহে, "দেখো, আরও কাছে এসো, বাঁশীটি লও ত হাতে
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখি নোলক দোলার সাথে !"

বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার,
"আচ্ছা আমার বাহুটি নাকিগো সোনালী-লতার হার ?
এই ঘুরালেম, বাজাও ত দেখি এরি মত কোন সুর,"
তেমনি বাহুর পরশের মত বাজে বাঁশী সুমধুর !
দুটি করে রাঙা ঠোঁটখানি টেনে কহে বউ, "এরি মত,
তোমার বাঁশীতে সুর যদি থাকে বাজাইলে বেশ হত।"
চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোঁট ছুঁয়ে কলমী ফুলের বুকে,
ছোট চুমু রাখি চলে যেন বাঁশী, চলে সে যে কোন লোকে।

এমনি করিয়া রাত কেটে যায়; হাসে রবি ধীরি ধীরি,
বেড়ার ফাঁকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেয়ালীর ছিরি।

সেদিন রাত্রে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা-চাঁদ এনে ধরে।
তারপরে, খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম-ফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি,
মৃদু তালে তালে নিঃশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা, ও-যে দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল !
হায় রূপা, তুই চোখের কাজলে আঁকিলি মোহন ছবি,
এতটুকু ব্যথা না লাগিতে যেরে ধুয়ে যাবে তোর সবি !
ওই বাহু আর ওই তনু-লতা ভাসিছে সোঁতের ফুল,
সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসিয়া যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল !
বাঁশী লয়ে রূপা বাজাতে বসিল বড় ব্যথা তার মনে,
উদাসীয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে।

ধারায় ধারায় জল ছুটে যায় রূপার দুচোখ বেয়ে,
বউটি তখন জাগিয়া উঠিল তাহার পরশ পেয়ে।
"ওমা ওকি ? তুমি এখনো শোওনি ! খোলা কেন মোর চুল?
একি! দুই পায়ে কে দেছে ঘষিয়া রঙিন কুসুম ফুল ?
ওকি ! ওকি !! তুমি কাঁদছিলে বুঝি ! কেন কাঁদছিলে বল ?"
বলিতে বলিতে বউটির চোখ জলে করে ছল ছল !
বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
"শোন শোন সই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে !

"সে দূর কোথায় ?" "অনেক—অনেক—দেশ যেতে হয় ছেড়ে,
সেথা কেউ নাই শুধু তুমি আর সেই সে অচেনা ফেরে।
তুমি ঘুমাইলে সে এসে আমায় কয়ে যায় কানে কানে,
যাই—যাই—ওরে নিয়ে যাই আমি আমার দেশের পানে।
বল, তুমি সেথা কখন যাবে না, সত্য করিয়া বল!"
"নয় ! নয় ! নয় !" বউ কহে তার চোখ দুটি ছলছল।

রূপা কয় "শোন সোনার বরণি, আমার এ কুঁড়ে ঘর,
তোমার রূপের উপহাস শুধু করে সারাদিন ভর।
তুমি ফুল ! তব ফুলের গায়েতে বহে বিহানের বায়ু,
আমি কাঁদি সই রোদ উঠিলে যে ফুরাবে রঙের আয়ু।
আহা আহা সখি, তুমি যাহা কর, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরাণে কেবল দিয়ে যায় বেদনাই।"
এমন সময় বাহির হইতে বছির মামুর ডাকে,
ধড়মড় করি উঠিয়া রূপাই চাহিল বেড়ার ফাঁকে।

এগারো

সাজ সাজ বলিয়ারে শহরে পৈল সাড়া,
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।
প্রথমে সাজিল মর্দ আহ্লাদি ডগরী,
পাঁচ কাঠা ভূঁই জুইড়া বসে মর্দ এয়সা ভারি।
তারপরে, সাজিল মর্দ তুরুক আমানি,
সমুদ্দুরে নামলে তার হৈত আঁটুপানি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে লোহাজুড়ী
আছড়াইয়া মারত সে হাতীর শুঁড় ধরি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে আইন্দ্যা ছাইন্দ্যা,
বাইশ মণ তামাক নেয় তার লেংটির মধ্যে বাইন্ধ্যা।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে মদন ঢুলি,
বাইশ মণ পিতল তার ঢোলের চারটা খুলী।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরী ঠাটা,
মেঘনাল সাজিয়া আইল তাম তুরুকের বেটা।
তুগুলি মুগুলি সাজে তারা দুই ভাই,
ঐরাবতে সাইজা আইল আজদাহা সেপাই।
বন্দুকি বন্দুকি চলে কামানে কামান,
ময়ূর-ময়ূরী চলে ধরিয়া পয়গাম।

— মহরমের জারী

"ও রূপা তুই করিস্ কিরে ? এখনো তুই রইলি শুয়ে ?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার ভূঁয়ে।"
"কি বলিলা বছির মামু ?" উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,
আগুনভরা দুচোখ হতে গোল্লা-বারুদ যায় উড়িয়া।

পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে !
লম্ফে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার সড়কি খানা,
ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে থালে থালে মারল হানা।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা,
সাউদ পাড়ার খাঁরা কোথায় ? কাজীর পোরে[১] আন ডাকিয়া ?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় থাকতে মোরা গফর-গাঁয়ে,
এই কথা আজ শোনার আগে মরিনি ক্যান্ গোরের ছায়ে ?
'আলী — আলী[২]' হাঁকল রূপাই, হুঙ্কারে তার গগন ফাটে,
হুঙ্কারে তার গর্জে বছির আগুন যেন ধরল কাঠে !
ঘুম হতে সব গাঁয়ের লোকে শুনল যেন রূপার বাড়ি;
আকাশ হতে ভাঙছে ঠাটা[৩], মেঘে মেঘে লাগছে বাড়ি।
ডাক শুনে তার আসৃল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসৃল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া।
আসৃল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পরি,
এক নিমিষে গাঁয়ের লোকে রূপার বাড়ি ফেলল ভরি।
লম্ফে দাঁড়ায় ছমির লেঠেল, মমিনপুরের চর দখলে,
এক লাঠিতে একশ লোকের মাথা যে জন আসৃল দলে।
দাঁড়ায় গাঁয়ের ছমির বুড়ো, বয়স তাহার যদিও আশী,
গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।

১। পো=ছেলে।

২। আলী=হজরত আলী; হজরত মুহাম্মদের (দঃ) জামাতা। তিনি মহাবীর ছিলেন। এদেশে মারামারির সময় সকলে মিলিয়া "আলী আলী" শব্দ করে। কারও কারও মতে "আলী" আল্লা' শব্দের অপভ্রংশ।

৩। ঠাটা=অশনি।

গর্জি উঠে গদাই ভূঁঞা, মোহন ভূঁঞার ভাজন[1] বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের নীল কুঠিতে লাগল লেঠা।
সব গাঁর 'লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর স্বরে।

রূপা তখন বেড়িয়ে তাদের বলল, "শোন ভাই সকলে,
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে।"
বছির মামু বলছে খবর—মোল্লারা সব কালকে নাকি:
আধেক জমির ধান কেটেছে, আধেক আজও রইছে বাকি।
"মোদের খেতে ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির[2] খোঁচায়;
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়।"
থামল রূপাই—ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে, লাটিম হেন ঘোড়ার লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।

রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, "থাল বাজারে থাল বাজারে,
থাল বাজারে সড়কি ঘুরা হান্‌রে লাঠি এক হাজারে।
হান্‌রে লাঠি — হান্‌রে কুঠার, গাছের ছ্যান[3] আর রাম-দা-ঘুরা,
হাতের মাথায় যা পাস যেথায় তাই লয়ে আজ আয়রে তোরা।"
"আলী ! আলী ! আলী !! আলী !!!" রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি,
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে কাঁপ্‌ছে আকাশ কাঁপ্‌ছে মাটি।
তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির পরে হানল লাঠি,
"আলী-আলী" শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।

১। ভাজন=ঔরসজাত। ২। কাঁচির=কাস্তের।
৩। গাছের ছ্যান=খেজুর গাছের ডগা কাটবার অস্ত্র।

আগে আগে ছুটল রূপা — বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে
চল্‌ল পাছে হাজার লেঠেল "আলী-আলী" শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি !
চল্‌ল তারা মাঠ পেরিয়ে চল্‌ল তারা বিল ডিঙিয়ে
কখন ছুটে কখন হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চল্‌ল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাও কুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধূলি পথ ভরি হায় !

দুপুর বেলা এল রূপাই গাজনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এল হাজার লেঠেল সড়কি লাঠি হস্তে ধরে !
লম্ফে রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে,
থাক্‌ল খানিক মাঠের মাটি দন্ত দিয়ে কামড়ে ধরে।
মাটির সাথে মুখ লাগায়ে, মাটির সাথে বুক লাগায়ে,
"আলী ! আলী !!" শব্দ করি মাটি বুঝি দ্যায় ফাটায়ে।
হাজার লেঠেল হুঙ্কারী কয় "আলী আলী হজরত আলী,"
সুর শুনে তার বন-গেঁয়োদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি !
তারাও সবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
"আলী আলী" শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁখান !
সামনে চেয়ে দেখল রূপা সার বেঁধে সব আসছে তারা,
ওপার মাঠের কোল ঘেঁষে কে বাঁকা তীরে দিচ্ছে নাড়া।
রূপার দলে এগোয় যখন, তারা তখন পিছিয়ে চলে,
তারা আবার এগিয়ে এলে এরাও হটে নানান্ কলে।

এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হল যখন,
রূপা বলে, "এমন করে 'কাইজা' করা হয় না কখন।"

তাল ঠুঁকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি,
"আলী-আলী — হজরত আলী" কণ্ঠ তাদের যায় যে ফাটি।
তাল ঠুঁকিয়া পড়ল তারা বন-গেঁয়োদের দলের মাঝে,
লাঠির আগায় লাগল লাঠি, লাঠির আগায় সড়কি বাজে।
'মার মার মার' হাঁকল রূপা, — 'মার মার মার' ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,
জীবনের এক সত্য মহান লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে !
মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
মহাকালের বাজছে বিষাণ আজকে ধরার প্রলয় কালে।
নাচে রূপা — নাচে রূপা—লোহুর গাঙে সিনান করি,
মরণরে সে ফেলছে ছুঁড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
নাচে রূপা — নাচে রূপা — মুখে তাহার অট্টহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।
— হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন
কি যেন সে দেখেছে আজ, রুধ্‌তে নারে তারি মাতন।
বন-গেঁয়োরা পালিয়ে গেল, রূপার লোকও ফিরল বহু,
রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা-খুনের হাস্‌ছে লোহু।

বার

রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে।

বেলা গেল সন্ধ্যা হইল — ও হৈলরে ! গৃহে জ্বালাও বাতি,
না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাতিরে !
রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।
রাইত না এক পরের হৈল, ও হৈলরে ! তারায় জ্বলে বাতি;
রান্ধিয়া বাড়িয়া অন্ন জাগৃব কত রাতিরে :
রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।
রাইত না দুই পরের হৈল ও হৈল রে. ডালে ডাকে শুয়া,
অঞ্চল বিছায়া নারী কাটে চেকন গুয়ারে।
রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।
রাইত না পরভাত হৈল — ও হৈলরে. কোকিল করে কুয়া,
খুইলে দাও মন্দিরার কেওয়াড় লাগুক শীতল হাওয়ারে।
রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।

— রাখালী গান

রূপাই গিয়াছে 'কাইজা' করিতে সেই ত সকাল বেলা,
বউ সারাদিন পথ পানে চেয়ে, দেখেছে লোকের মেলা।
কত লোক আসে কত লোক যায়. সে কেন আসে না আজ,
তবে কি তাহার নসিব মন্দ, মাথায় ভাঙিবে বাজ !
বালাই, বালাই,. ওই যে ওখানে কালো গাঁর পথ দিয়া,
আসিছে লোকটি, ওই কি রূপাই ? নেচে ওঠে তার হিয়া।
এলে পরে তারে খুব বকে দিবে, মাথায় ছোঁয়ায়ে হাত,
কিরা করাইবে লড়ায়ের নামে হবে না সে আর মাত্।

আঁচলে চোখেরে বারবার মাজে, না রে সে ত ও নয়,
আজকে তাহার কপালে কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।
লোহুর সাগরে সাঁতার কাটিয়া দিবস শেষের বেলা,
রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।
পথে যে আঁধার পড়িল সাজুর মনে তার শতগুণ,
রাত এসে তার ব্যথার ঘায়েতে ছিটাইল যেন নুন !

ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্সী-কাঁথা,
সেলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায়, খস্ খস্ খস্ শুনে কান খাড়া করে,
যারে চায় সে ত আসেনাক শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে, ভাল লাগেনাক তার;
আলো হাতে লয়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।
কেন আসে নারে ! সাজুর যদি গো পাখা দিত আজ বিধি,
উড়িয়া যাইয়া দেখিয়া আসিত তাহার সোনার নিধি।
নক্সী-কাঁথায় আঁকিল যে সাজু অনেক নক্সী-ফুল,
প্রথমে যেদিন রূপারে সে দেখে, সে খুশীর সমতুল।
আঁকিল তাদের বিয়ের বাসর, আঁকিল রূপার বাড়ি,
এমন সময় বাহিরে কে দেখে আসিতেছে তাড়াতাড়ি।

দুয়ার খুলিয়া দেখিল সে চেয়ে — রূপাই আসিছে বটে,
"এতক্ষণে এলে ? ভেবে ভেবে যেগো প্রাণ নাই মোর ঘটে।
আর যাইও না কাইজা করিতে, তুমি যাহাদের মারো,
তাদের ঘরে ত আছে কাঁচা বউ, ছেলেমেয়ে আছে কারো।"
রূপাই কহিল কাঁদিয়া, "বউগো ফুরায়েছে মোর সব,

রাতে ঘুম যেতে শুনিবে না আর রূপার বাঁশীর রব।
লড়ায়ে আজিকে কত মাথা আমি ভাঙিয়াছি দুই হাতে,
আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।
লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি।
আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম !"

বউ কেঁদে কয়, "কি হয়েছে বল, লাগিয়াছে বুঝি কোথা,
দেখি ! দেখি !! দেখি !!! কোথায় আঘাত, খুব বুঝি তার ব্যথা !"
"লাগিয়াছে বউ, খুব লাগিয়াছে, নহে নহে মোর গায়,
তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়েছে, কাঁকন ভেঙেছে হায় !
তোমার পায়ের ভাঙিয়াছে খাড়ু, ছিঁড়েছে গলার হার,
তোমার আমার এই শেষ দেখা, বাঁশী বাজিবে না আর।
আজ 'কাইজার' অপর পক্ষে খুন হইয়াছে বহু।
এই দেখ মোর কাপড়ে এখনো লাগিয়া রয়েছে লোহু।
থানার পুলিশ আসিছে হাঁকিয়া পিছে পিছে মোর ছুটি,
খোঁজ পেলে পরে এখনি আমায় ধরে নিয়ে যাবে টুটি !
সাথীরা সকলে যে যাহার মত পালায়েছে যথা-তথা,
আমি আসিলাম তোমার সঙ্গে সেরে নিতে সব কথা।
আমার জন্য ভাবিনাক আমি, কঠিন ঝড়িয়া-বায়,
যে গাছ পড়িল, তাহার লতার কি হইবে আজি হায় !
হায় বনফুল, যেই ডালে তুই দিয়েছিলি পাতি বুক,
সে ডালেরি সাথে ভাঙিয়া পড়িল তোর সে সকল সুখ।
ঘরে যদি মোর মা থাকিত আজ তোমারে সঙ্গে করি,
বিনিদ্র রাত কাঁদিয়া কাটাত মোর কথা স্মরি স্মরি !

ভাই থাকিলেও ভাই-এর বউরে রাখিত যতন করি,
তোমার ব্যথার আধেকটা তার আপনার বুকে ভরি।
আমি যে যাইব ভাবিনাক, সাথে যাইবে কপাল-লেখা,
এ যে বড় ব্যথা ! তোমারো কপালে এঁকে গেনু তারি রেখা।"
সাজু কেঁদে কয়, "সোনার পতিরে তুমি যে যাইবে ছাড়ি,
হয়ত তাহাতে মোর বুকখানা যাইতে চাহিবে ফাড়ি।
সে দুখেরে আমি ঢাকিয়া রাখিব বুকের আঁচল দিয়া,
এ পোড়া রূপেরে কি দিয়ে ঢাকিব—ভেবে মরে মোর হিয়া।
তুমি চলে গেলে পাড়ার লোকে যে চাহিবে ইহার পানে,
তোমার গলার মালাখানি আমি লুকাইব কোন্ খানে !"

রূপা কয়, "সখি দীন দুঃখীর যারে ছাড়া কেহ নাই,
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই।
মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে, পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।"

এমন সময়ে ঘরের খোপেতে মোরগ উঠিল ডাকি,
রূপা কয়, "সখি ! যাই — যাই আমি — রাত বুঝি নাই বাকি!"
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়; সাজু কয়, "ওগো শোন,
আর কিগো নাই মোর কাছে তব বলিবার কথা কোন ?
দীঘল রজনী — দীঘল বরষ — দীঘল ব্যথার ভার,
আজ শেষ দিনে আর কোন কথা নাই তব বলিবার ?"
রূপা ফিরে কয়, "না কাঁদিয়া সখি, পারিলামনাক আর,
ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল[১] দেয়ার ধার।"

১। নিশাল = অবিরাম।

"এই শেষ কথা !" সাজু কহে কেঁদে, "বলিবে না আর কিছু ?"
খানিক চলিয়া থামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিছু,
"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে — না শুনি আমার বাঁশী,
বাহুখানি তুমি এলাইও সখি মুখে মেখে রাঙা হাসি।
চেয়ো মাঠ পানে — গলায় গলায় দুলিবে নতুন ধান;
কান পেতে থেকো, যদি শোন কভু সেথায় আমার গান।
আর যদি সখি, মোরে ভালবাস মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া!"

ঘরের খোপেতে মোরগ ডাকিল, কোকিল ডাকিল ডালে,
দিনের তরণী পূর্ব সাগরে দুলে উঠে রাঙা পালে।
রূপা কহে, "তবে যাই যাই সখি, যেটুকু আঁধার বাকি,
তারি মাঝে আমি গহন বনেতে নিজেরে ফেলিব ঢাকি।"
পায়ে পায়ে পায় কতদূর যায়, তবু ফিরে ফিরে চায়;
সাজুর ঘরেতে দীপ নিবু নিবু ভোরের উতলা বায়।

তেরো

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে।
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যায়া দিতাম দেখা;
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশেরে।
আমরা ত অবলা নারী,
তরুতলে বাসা বান্ধিরে
আমার বদন চুয়ায়া পড়ে ঘামরে।
বন্ধুর বাড়ী গঙ্গার পার
গেলে না আসিবা আর;
আমার না-জান বন্ধু, না জানে সাঁতাররে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইসা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণরে।
—রাখালী গান

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
দিনে দিনে দিন নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে ছলি।
কাইজায় যারা গিয়াছিল গাঁর, তারা ফিরিয়াছে বাড়ি,
শহরের জজ, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
স্বামীর বাড়িতে একা মেয়ে সাজু কি করে থাকিতে পারে,
তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মত,
প্রতিদিন আসি, বুকখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত।
ও-গাঁয়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হায়,

খুঁটি ভেঙে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের গায়।
প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি।
দুখের রজনী যদিও বা কাটে—আসে যে দুখের দিন,
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।
কৃষাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
কি করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান !
কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হায় কেন,
মনের-মতন কাঁদায় তাহারে 'পথের কাঙালী' হেন ?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা।
কোন্ জালুয়ার[১] মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তার কড়ি,
তারি অভিশাপ ফিরিছে কি তার সকল পরাণ ভরি !
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে,
তাহারই ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে !
তোর দেশে বুঝি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদারুণ বিধি
কোন্ প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি।
নয়ন হইতে উড়ে গেছে হায় তার নয়নের তোতা,
যে ব্যথারে সাজু বহিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা ?

১। জালুয়া=জেলে।

এমনি করিয়া কাঁদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
আনমনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকাল যে কাটে—দুপুর কাটিয়া যায়,
সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালী মেঘের নায়।
তবু ত আসে না। বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
পারে যদি তবে ছিঁড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।

মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোন মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছো কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।
গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
কোন দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়েনি হায় !
খুব ভাল করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ী ভাবে মনে মনে,
রূপাই কোথাও পালাইয়া আছে হয়ত হাটের কোণে।
ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁর,
নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।
জনে জনে বুড়ী বলে দেয়, "দেখ, যখন যেখানে যাও,
রূপার তোমরা তালাস লইও, খোদার কছম খাও।"
বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
বুড়ী ডেকে কয়, "রূপারে তোমরা দেখ নাই কোন গাঁয়ে!"
বুড়ীর কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
কি করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিবার তরে,
মাথাল মাথায় বিদেশী চাষীরা সারা গাঁও ফেলে ভরে।
সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে;

"তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও কারে,
নিটল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভারে ভারে।"
এমনি করিয়া বলে বুড়ী কথা, তাহারা চাহিয়া রয়, —
রূপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয়!
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হায়,
তারি ডালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায় ?

কেউ কেউ বলে, "তাহারি মতন দেখেছিনু একজনে,
আমাদের সেই ছোট গাঁর পথে চলে যেতে আন্‌মনে।"
"আচ্ছা, তাহারে শুধাও নি কেহ, কখন আসিবে বাড়ী,
পরদেশে সে যে কোন্ প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি ?"
গাঙে-পড়া-লোক যেমন করিয়া তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ী তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, "সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ী যেন আর কাঁদে না তাহার আশে!"
এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহূর্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।
মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে "ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোরে — খবর পেয়েছে তার।"
মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।
গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হায় নিদারুণ আশা,
ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা।
আজকে কতনা কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীণে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর, সেই হাট ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়ায়ে থাকিত গাঁয়ের পথের পরে।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে সে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে জেলে যেমনি কবিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায়, যত লয় তার প্রাণে;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোন কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।

আর যেন তার কোন কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবারুর মত ডুবিয়া ডুবিয়া মানিক মুকুতা মাঙে।
এতটুকু মান, এতটুকু স্নেহ এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা!
হায় অভাগিনী ! সে ত নাহি জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভূজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল।
যে বাঁশী শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা স্মরি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।

মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায় বাণী ---
"মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।"
আরও মনে পড়ে, "দীন দুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আল্লার চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই।"

হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিঠুর তার মন;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, 'শোনে না সে একজন।
গাছের পাতারা ঝরে পড়ে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায়রে বধির, তোর কানে আজ যায় না সাজুর কথা;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই এক বুক-ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে !
দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাউ-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজ ফেলে বাকি,
আমারে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কি করে কাটাও দীর্ঘ বরষ মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুন্‌গুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।

খুব ধরে ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায় — আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষাণ নারী,
দেখিছে — তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি।
আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে।
এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে।
তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে,
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝড়িয়া-বায়ে।
কি যেন দারুণ রোগেতে ধরিল, উঠিতে পারে না আর;
শিয়রে বসিয়া দুঃখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
হায় অভাগীর একটি মানিক! খোদা, তুমি ফিরে চাও,
এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও!
ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল! রহমান তব নাম,
দুনিয়ায় আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও বাম !

মেয়ে কয়, "মাগো ! তোমার বেদনা জানি আমি সব জানি,
তার চেয়ে যেগো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকখানি !
সোনা মা আমার ! চক্ষু মুছিয়া কথা শোন, খাও মাথা,
ঘরের মেঝে মেলে ধর দেখি আমার নক্সী-কাঁথা !
একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সূঁচ সুতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।"
পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখি জল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।

কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি:
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে,
অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি, বুক যায় জলে ভেসে।

মনের মতন আঁকি এই ছবি দেখে বারবার করি,
দুটি পোড়া চোখ বারবার শুধু অশ্রুতে উঠে ভরি।
দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
"সোনা মা আমার ! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি:
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে !
সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল ;
হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই !
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।"
বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কি দারুণ ব্যথা !

কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
"সাজু সাজু ! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয় ?"
"আল্লা রসুল ! আল্লা রসুল !" বুড়ী বলে হাত তুলে,
"দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ আজিকে যেয়ো না ভুলে!"
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, সব খালি ! সব খালি !!
"সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে।"

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

চৌদ্দ

উইড়া যায়রে হংস পঙ্খি পইড়া রয়রে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইব — কে করিবে মায়া।
— মুর্শিদা গান

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন্ কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি,
ফাগুনের রোদে শুখাইছে যেন কি ব্যথারে মূক মাটি!
নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি,
কোন্ সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি!

বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধুলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয়ে ম্লান!
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে!
মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবেগো জাতি-কুল।
লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটিরে চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে।

তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই গাঁওটির পানে.
কত দিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে।
মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ;
সারা বুক ভরি কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ !
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের ? যদি লাগে কারো ধাঁধা,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোন এর বাধা !

সকলেই জানে, সেই কোন্ কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি ;
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
খণ্ডাবে কেবা ? দারুণ দুঃখ ভালে এঁকে গেল রেখা !
রূপা এক দিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,
তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল — তাহার নক্সী-কাঁথা,
কবরের গায় মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা :

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে, —
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে :
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায় !
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙিন শাড়ী,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি !

সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই সে নক্সী-কাঁথা, —
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে, —
মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নক্সী-কাঁথাটি ধরে;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশীটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ওগাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে।
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ,
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।

শেষ

নক্সী-কাঁথার মাঠ প্রসঙ্গে

দীনেশচন্দ্র সেন

(১৮৬৬-১৯৩৯)

শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসের গবেষক। পল্লীঅঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করেন। এসব পুঁথি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুশৃঙ্খল ও তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) রচনা করেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩) এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬) সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ খোলা হলে সে-বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গলা ভাষার শ্রী উল্টিয়া গিয়াছে। যেমন আজকাল দুধে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, মধুতে ভেজাল, মেঠাই-এ ভেজাল, তেমনই এখন সাহিত্যে ভেজালের ছড়াছড়ি, এমন যে তিলোত্তমা, তাতেও নাকি বেবেকার ভেজাল আছে। উর্বশী পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এ পিপ, সাইকিডিয়ান মনে পড়িয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজি সমাজ আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গলা সমাজের গায়ে যে দাগ দিয়া যাইতেছে, তাহা বড় স্পষ্ট এবং সময়ে কলঙ্কস্বরূপ।

কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গলা পল্লীর শ্রী আমরা একবার দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গালী সাধ্বীর মাথায় বড় সিন্দূরে টিপটি দেখিয়াছিলাম, — নববিবাহিতা কিশোরী কাঁকন ও নূপুরের রুনুঝুনু শুনিয়াছিলাম,—শুভ্র রজনীগন্ধার ন্যায় শ্বেতবসনা বিধবার হোমাগ্নিবশত উজ্জ্বল ব্রহ্মচর্য দেখিয়াছিলাম;— সেই পল্লীর স্বর্ণশ্রী— যাহাতে বাঙ্গালীর ঘরকন্না ঝল্‌মল করিত, তাহা আর যেন তেমনভাবে দেখিতে পাই না। বিদেশের আমদানী বাহিরের চাকচিক্যপূর্ণ অনুকৃতি প্রাণহীন খেলনার মতো মনে হয়, এখন এসব আর চোখে লাগে না। পল্লীর তরুণ তরুর ছায়া ও শ্যামল দূর্বা এখন শহরের প্রসাদ হইতে ভাল লাগে। এদেশকে কেহই ঐশ্বর্য দিয়া দীর্ঘকাল ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না— এ যে মাধুর্যের দেশ।

তাই আজ জসীম উদ্‌দীনের "নক্সী-কাঁথার মাঠ" কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম— সেই পল্লীর পথ-ঘাট— এ যেন কত চেনা— হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লী রাখালের চোখজুড়ানো কালোরূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি— বাঙ্গালীর বিবাহবাসর, গিন্নীর ঘর-কন্না—এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী-দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল—

এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিস নূতন পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীম উদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। ইনি তরুণ বয়স্ক কিন্তু বীর-বিক্রম। ইনি কবিতা-রাজ্যে যে পাঠশালা খুলিলেন, তাহা ইঁহার নিজের আবিষ্কার। জানি না শহরে থাকিয়া কবি তাঁহার এই সবুজ প্রাণ, বঙ্গজীবনের অতুলনীয় গ্রাম্য সম্পদ— ঘর-কন্নার এই সাঁঝের ভোগ হারাইয়া ফেলিবেন কি না।

সর্ব-গ্রাসী শহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্ত্তি বজায় রাখা বড় শক্ত।

আমরা কাব্যখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। ১৪টি ছোট ছোট দৃশ্যপটে এই কাব্যচিত্র সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অঙ্কে বাঙ্গালীর কুটীরগুলির এক একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উহা যেমনই পূর্ণ, তেমনই কবিত্বময়, এই কবিত্ব সংস্কৃত বা ইংরেজি হইতে ধার করা নহে। কবি একজন গ্রাজুয়েট, ইচ্ছা করিলে সেরূপ ধার পাইতেন, কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁহার অপরিশোধনীর পল্লীমাতৃকার ঋণ শোধ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কাহারও কাছে দান পাওয়ার জন্য হাত বাড়ান নাই।

প্রথমাঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়— একটি মাঠ দিয়া বিভক্ত করা দুইটি পাশাপাশি গ্রাম, সেই মাঠটিই কালে "নক্সী-কাঁথার মাঠ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দুইটি গ্রাম দুইটি পাতার মতো জড়াজড়ি করিয়া আছে— ইহাদের মধ্যে ভাব ও অসদ্ভাব— কিছুরই অভাব নাই;—

"ও-গাঁর বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁয় এসেও লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঝুমরাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
এ-গাঁও হতে ভাটির সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় যে পেতে কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে,
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।"

এই ভাব -বনিময় সত্ত্বেও সময়ে সময়ে সুরটা বেসুরো হইয়া বাজে :—

"এ-গাঁর লোকে করতে পরখ ও-গাঁর লোকের বল
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।"

দ্বিতীয় অঙ্কে কাব্যের নায়ক কিশোর রূপার চিত্র। রূপা চাষার ছেলে— তাহার বর্ণটি কালো। এই কালো রূপে সে সমস্ত গ্রামটি আলো করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমান কবির চোখে এই কালো রংটি সকল রং-এর সেরা— এখানে ইনি বৈষ্ণব কবির মতো :—

> "কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
> তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।"

রূপা শুধু কালো রং ও কিশোর মূর্তি দিয়া সেই গ্রামটি মুগ্ধ করে নাই,

> আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
> খেলার দলে তারেই নিয়ে সবার টানাটানি।
> জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
> শাল-সুন্দী-বেত "যেন ও সকল কাজেই লাগে।"

তৃতীয় অঙ্কে নায়িকা সাজুর কথা, কবি বলিতেছেন এই রূপসী কিশোরী "তুলসীতলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা," সে যেন "দেবদেউলের ধূপ" কিন্তু মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াও তিনি মুসলমানের গৃহের আঙ্গিনার কথা ভুলিয়া যান নাই।

সাজুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী"। সাজু হাঁড়ির উপর নানারূপ চিত্র আঁকিতে জানে, সিকায় ফুল তুলিতে তাহার হাত অতি নিপুণ, "বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে, সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে বলে কি লোক সাধে?"

ইহার পর কয়েক অঙ্কে শ্যামল কিশোর নায়ক ও কিশোরী গৌরী সাজুর প্রেমের লুকোচুরি খেলা;— এখানে যৌবনের উদ্দাম স্ফূর্তি, করস্পর্শে অঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া যাওয়া, রূপের ফাঁদে প্রেমিককে পাড়িয়া ফেলিয়া তাহার জীবন-মরণ সমস্যার সৃষ্টি করা— এসকল দুরন্ত অভিনয়ের কিছুই নাই। কিশোর-কিশোরী এখানে আদতেই খেলোয়াড় নহে— ইহারা ভালবাসার পাঠ নূতন শিখিতেছে। সাজু মেঘের পূজার মাগুন চাহিতে চলিয়াছে— সঙ্গে চারজন খেলার সাথী। রূপার মা তাহাদিগকে একসের ধান দিলেন। কিন্তু হঠাৎ সাজুকে দেখিয়া পরম উদ্যমে রূপা আসিয়া বলিল : "এই দিলে মা থাকবে না আর মান," এবং আরও পাঁচ সের দিয়া তরুণ হৃদয়ের অনুরাগের উৎসাহ ও আবেগ দেখাইল। রূপা বাঁশ কাটিতে গিয়াছে,

সেখানে আবার সাজুকে দেখিতে পাইল; প্রাণে পুলক, তাহা ঢাকিতে পারিতেছে না, দেখিবার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু লজ্জায় সাহস করিয়া চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না। কিশোর বয়সের এই সপ্রতিত লাজুকতার চিত্র কবি এমন নিপুণ তুলিতে আঁকিয়াছেন তাহার সমালোচনার চেষ্টা বৃথা মনে হয়— কেবল বলিতে ইচ্ছা করে "কি সুন্দর!" সাজুর মা রূপাকে আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন— রূপা যাহা খায় তাহারই প্রশংসা করিতেছে। সেই প্রশংসা শুনিয়া সাজুর মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে— কারণ সে-ই ত রান্না করিয়াছে। তার পরে শত ছলে ও ছুতোয় রূপা কতবার সাজুদের বাড়ীতে যাইতেছে। সেই সকল ছলনা প্রায় ধরা পড়িয়া যাইতেছে। এক দিন সে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে সাজুর মা জিজ্ঞাসা করিল— "অসময়ে এসেছ কেন বাবা?" সে বলিল, "খালাম্মা, তোমার জ্বর হয়েছে শুনেছি, তাই তোমার খাবার জন্য আধাসের গজা কিনে এনেছি।" "কই, আমার তো জ্বর হয়নি! আর জ্বর হলে কি গজা খায় কেউ?" সাজুর মায়ের এই উক্তিতে বালকের অসতর্ক চাতুরী ধরা পড়িয়া গেল, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এরূপ লুকোচুরি খেলা অনেক আছে— "এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি তরুণ হিয়া, এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনি-সূতি মালা দিয়া।"

কিন্তু এবার দুজনেই কিশোর বয়সের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনের অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে। তখন যাহা সরল ও অনাবিল ছিল, তাহা জটিল সমস্যায় দাঁড়াইল। কৈশোরের উচ্ছল লীলা খেলা সংযমের বাধা মানিয়া চলিল— তথাপি বেল ফুলের ন্যায় অতি নির্মল দুইটি প্রাণের কথা লইয়া দুষ্ট প্রতিবেশীরা নির্মমভাবে টানাহেঁচড়া করিতে ছাড়িল না, তাহারা কলঙ্ক রটাইতে শুরু কলিল, অকর্মা সংবাদবাহী বুড়ীদের গ্রাম্য অবসর পূরণের বেশ একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। "টুনীর ফুপু হাতে ডলতে তামাক পাতা, এমন সময় ওই গাঁ হতে আসল খেঁদির মাতা, ক'জনকে আর থামিয়ে রাখে?"— এই অযাচিত নিন্দা ও উপদেশে সন্ত্রস্ত হইয়া রূপার মা তাঁহার ছেলের সঙ্গে সাজুর বিবাহ স্থির করিয়া পাড়া পড়শীর শাণিত জিহ্বা ভোঁতা করিয়া দিলেন। এই বিবাহের ঘটকালী হইতে বাসর রজনীর শেষ পর্যন্ত কবি যে দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় কৃষক গৃহের একখানি নিখুঁত সামাজিক চিত্র। দুখাই ঘটক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সাজুর মায়ের কাছে যাইতেছে :— কবি লিখিতেছেন :—

"দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ী
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি।
ধানের জমি বাঁয়ে ফেলিয়া ডাইনে ঘনপাট,
জলীর বিলে নাও বাহিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।"

বিবাহের আসরের বর্ণনা খুব একটা জমকালো রকমের—

"বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ী
কাছারি ঘর গুমগুমাগুম লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি,
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্পগানে মাতি।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ী
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ ফাটা ডাক ছাড়ি।"

তারপরে মিঞারা কত কেচ্ছা শুনাইয়া সমবেত লোকদের মন-হরণ করিতেছেন,— হানিফের কথা, জয়গুন বিবির কথা শুনিয়া লোকেরা মাতিয়া গিয়াছে,— হানিফের যুদ্ধ-বর্ণনায় খুব বাহাদুরী—

"কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়েছে যেন সুন্দরবনি বাঘ।"

এদিকে আবার—

"উঠান 'পরে হল্লা করে পাড়ার ছেলেমেয়ে,
রঙীন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।"

পরের অঙ্কে রূপা ও সাজুর গৃহস্থালী। এইখানে বাঙ্গালী চাষীজীবনের সুখ-দুঃখ ও জীবনের মূল সূত্রটি অতি স্পষ্ট রেখায় আঁকা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সাজু স্বামীর পায়ের টিপ্ পরিয়া কত আহ্লাদে অবিশ্রান্ত গৃহকর্ম করিতেছে; অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ধানের মলন চলিতেছে— নবীনা কৃষাণী "ঢেঁকির পাড়েতে মুখর করিছে একলা সারাটি বাড়ী।"কোন কোন দিন হেমন্তের জ্যোৎস্নায় সাজু, "ঘুমায়ে পড়িছে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।" সারা দিনের শ্রান্তির পর দম্পতির সুখ-শয়ন। এক রাত্রির কথা এইরূপ :—

"সেইদিন রাতে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তার রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে।

তারপর খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম ফুলেতে রাঙা পাও দু'টি দেখে আরো রাঙা করি'।
মৃদু তালে তালে নিশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি' যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল।"

একাদশ অঙ্কে জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা। রূপা চাষার ছেলে কিন্তু বাঙ্গালী সন্তান। তার প্রাণের প্রেম ও হাতের লাঠি উভয়ই অতুলনীয়। তাহার হাতে বাঁশের বাঁশী ও বাঁশের লাঠি এ দুইই অনিবার্য। একদিকে সে ফুলসম মৃদু মৃদু হিল্লোলে প্রেমের গান গাইতেছে, অপর দিকে ঝগড়ার স্থলে সে দুর্দান্ত পশুর মত। দুই দলে বিবাদ বাঁধিয়াছে—তরুণ রূপা এক দলের নেতা। মত্তহস্তী যেরূপ শত দলের বেষ্টনী হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, রূপা এক মুহূর্তে কোমল আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া নির্মম উৎসাহে বন-ভূমির দিকে চলিয়াছে :—

"আলী আলী আলী আলী রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে, কাঁপছে আকাশ কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লেঠেলে লাঠির 'পরে হানল লাঠি,
আলী আলী শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।
আগে আগে ছুটল রূপা, বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে
কালসাপের ফণার মত বাবরী মাথার চুল যে ওড়ে।
চলল পাছে হাজার লেঠেল আলী আলী শব্দ করি',
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি'।
চলল তারা মাঠ পেরিয়ে চলল তারা বিল ডিঙিয়ে,
কখন ছুটে কখন হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চলল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাওকুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধুলি পথ ভরি' হায়!"

বর্ণনাগুলি এরূপ জীবন্ত মনে হয় যেন আমরা রণক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি এবং দুই দলের উন্মত্ত বীরমূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

রূপা খুনের দায়ে পড়িয়া পুলিশের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য পলাইয়া গিয়াছে।

"ঘরের মেজেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্সী কাঁথা,
সিলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায় খস খস করে, শুনে কান খাড়া করে,
যারে চায় সেত আসে নাক শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে ভাল লাগে নাক তার,
আলো হাতে লয়ে দূর পানে চায় বার বার খুলে দ্বার।"

ইহা গ্রাম্য ভাষায় জয়দেবের "পততি পতত্রে, বিগলিত গাত্রে"র অনুবাদ। সেই রাত্রে আকাশের গায়ে যখন শুকতারা ডুবু ডুবু শেষ রজনীর চাপা নিশ্বাস অতি ধীরে বাঙ্গলার কুটীরে বহিতেছে, চোখে পলক নাই, সাজু বসিয়া আছে। এমন সময় রূপা চোরের মতন ঘরে ঢুকিল। সুন্দরী গৃহিণীকে নিঃসহায় ভাবে ঘরে একেলা ফেলিয়া যাইতে যে মর্মান্তিক কষ্ট তাহা অতি অল্প কথায় রূপা ব্যক্ত করিতেছে। রূপার মা মারা গিয়াছেন, সাজু সেই শূন্য ঘর একলাটি কিরূপে আগলাইয়া থাকিবে? আজ শেষ, আর দেখা হইবে না— এই আলিঙ্গন শেষ আলিঙ্গন। রূপা অকূলে ঝাঁপ দিবে। সাজুর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-চক্ষে বলিল :

"মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে
পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া দিলাম
তাহার চরণ তলে।"

"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কালো কাজলের রাগে।
সিন্দূরখানি পরিও ললাটে মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশি কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি যতনে বাঁধিও চুল
অলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
আর যদি সখি মোরে ভালবাস, মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া।"

ইহার পর শেষাঙ্ক। কত বৎসর ধরিয়া সাজু একখানি কাঁথার উপর গৃহসন্নিহিত মাঠটির ছবি নক্সা করিয়া সুতায় বুনট করিতেছিল। সে যেদিন এই নক্সী কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করে, তখন—

"স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে— সেলাই করেছে সে যে,
গুনগুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।"

এই কাঁথা তৈরী করার সঙ্গে তাহার কত মধুর স্মৃতি জড়িত! সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এবার কোমল হস্তে সে নক্সার শেষ রেখাটি টানিল—

"খুব ধরে ধরে আঁকিল সে সাজু রূপার বিদায় ছবি, খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা আঁকিল সে তার সবি।"

কাঁথা আঁকার পালা এবার শেষ। কাঁথাখানি মেলিয়া সাজু নিজের বিছানার উপর ছড়াইয়া দিল— সেই শয্যাই তাহার মৃত্যুশয্যা, যখন চিরনিদ্রার ভারে চোখ দুটি মুদিয়া আসিতে লাগিল, তখন সে পার্শ্ববর্তিনী সোনা-মাকে বলিল :—

"সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি;
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর 'পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে!
সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে
হয়তো তাহারে কাঁদাইয়া আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার 'পরে।"

সাজুর মৃত্যুর পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে রূপাকে গ্রামের সকলে ভুলিয়া গিয়াছে—

"বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা
গভীর রাতের কালে,—
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী
বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল
সেই কবরের গায়,
রোগপাণ্ডুর একটি বিদেশী
মরিয়া রয়েছে হায়!

....

সারা গায়ে তার জড়ায়ে রয়েছে
সেই সে নক্সী-কাঁথা,
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া
গায় এ করুণ গাথা।"

নক্সী-কাঁথার মাঠে এমন অনেক কথা আছে, যাহা বাঙ্গলার আর কোন কবি এভাবে লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। গ্রামের মেয়েরা মেঘকে আবাহন করিতেছে। এই সকল মেঘ যে কতরূপে, কত লীলায় আকাশে বিচরণ করে তাহা এদেশের কৃষকেরা লাঙ্গল ঘাড়ে ফেলিয়া উর্দ্ধমুখে লক্ষ করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া গিয়াছে, পল্লীবালিকারা তাহাই আবৃত্তি করে। শিক্ষিত পাঠক পুষ্কর, আবর্ত প্রভৃতি মেঘের ভুবনবিদিত নাম অবশ্য জানেন, কালিদাসের কৃপায় তাহা মুখস্থ আছে, কিন্তু বাঙ্গলার চাষীরা মেঘকে আদর করিয়া যে কত নাম দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বালিকারা মেঘদর্শনে উল্লসিত হইয়া মেঘগুলিকে নাম ধরিয়া আহ্বানপূর্বক স্তবস্তুতি করিতেছে—

"কালো মেঘা' নামো নামো, 'ফুলতোলা মেঘ' নামো,
'ধুলট মেঘা', 'তুলট মেঘা', তোমরা সবে নামো!
'কানা মেঘা টলমল বার মেঘার ভাই,
আরো ফুটিক ওলক দিলে চীনার ভাত ভাই।
কাজল মেঘা' নামো নামো, চোখে কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
'আড়িয়া মেঘা", 'হাড়িয়া মেঘা' 'কুড়িয়া মেঘার' নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা 'সিঁদুর দিব' 'সিঁদুর মেঘের' গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"

গ্রামের মুসলমান মেয়েরা এখনও বোধ হয় এই ভাবের একটা ছড়া গাহিয়া থাকে। কবি তাহা আধুনিক ছন্দে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে বাঁশের যত প্রকার শ্রেণীভেদ আছে তাহারও একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে বোধ হয় তালিকা বলা ঠিক হইবে না, নীরস শুষ্ক কথাগুলি কবির হাতে পড়িয়া বেশ কাব্যময় ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

নক্সী-কাঁথার মাঠের কবি দেশের পুরাতন রত্ন-ভাণ্ডারকে নূতন ভাবে উজ্জ্বল করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া আনিয়াছেন। 'রাখালী' নামক কাব্যে ইহার প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, নক্সী-কাঁথার মাঠে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। বহু দিন হইল শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমি *ভারতবর্ষে* তাঁহার প্রথম অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম, আজ নক্সী-কাঁথার মাঠের কবিকেও আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত সম্বর্ধনা জানাইতেছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে কাব্যের পাঠ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। *কণিকাতে* রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন একটা মহাকাব্য রচনার তাঁহার সাধ ছিল, কিন্তু তাঁহার মর্মের কথা শত সুরে বাজিয়া উঠিল এবং মহাকাব্যের স্থান গীতিকবিতা অধিকার করিয়া বসিল। কবি হয়ত ইহা পরিহাস করিয়াই বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবির এই উক্তির পর বাঙ্গলার উদীয়মান কবিরা কবিতায় উপাখ্যান রচনা ছাড়িয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনীর* ধরনে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাব্যোপখ্যান পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু অধুনা কাব্যের বাজার বড় মন্দা। জসীম উদ্‌দীনের এই বইখানি ছোট হইলেও ইহা একখানি কাব্য। ইহার উপাদান বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্ত, গীতিকবিতার কতকগুলি সুর ও ছন্দ, কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটা বড় রাগিণী সৃষ্টি করার শিল্পশক্তি ইঁহার আছে। নানা কুসুমের মালার মতই খণ্ডকবিতা লিখিয়া একটা অখণ্ড রূপ দেওয়ার বিলক্ষণ শক্তি ইনি দেখাইয়াছেন, ইহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রচুর সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখা যায়। অবনীন্দ্র বাবু এই কাব্যের ভূমিকায় কতকটা দ্বিধার সঙ্গে পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দ্বিধার ভাব আমারও আছে, যেহেতু এক সময় যাহা বলিতাম ও লিখিতাম তাহার উপর আমার প্রচুর আস্থা ছিল, কিন্তু এখন প্রতিক্ষণে মনে হয়, বাঙ্গলার নব আশা আকাঙ্ক্ষাদৃপ্ত তরুণের নূতন জগৎ ঠিক আমার কথায় সায় নাও দিতে পারেন, হয়ত যে যুগ আসিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গেছি। তরুণের সঙ্গে প্রাচীনের পা ফেলিয়া সমান তালে চলা শক্ত! তবে আমি আমার মনের কথা লিখিয়াছি, মনের শৈশব নাই, যৌবন ও বার্ধক্য নাই। মনের কথা বলিলে তাহার সম-মর্মী শ্রোতা হয়ত জুটিয়া যাইতে পারে।*

* ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় (৬৭১-৬৭৬ পৃঃ) প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' নামাঙ্কিত কাব্যের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ।

নক্সী-কাঁথার মাঠ প্রসঙ্গে

দুশন জবভিতেল

চেক ভাষার লেখক। চেক ভাষায় নক্সী-কাঁথার মাঠ বইয়ের অনুবাদক। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল বিভাগের প্রধান ছিলেন। জার্মান ভাষায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের কতিপয় রচনার অনুবাদক। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে জার্মান ও চেক ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন।

দুই বছর আগে কবি জসীম উদ্‌দীনের একটি বই প্রথম বার আমার হাতে পড়ল—তাঁর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ'। সেদিন যে কথা ভাবলাম আজও আমার মনে আছে—কী অপূর্ব বই! তারপর বারবার বইটা পড়েছি, বা কবি জসীম উদ্‌দীনের আরও কয়েকখানা বই পড়েছি, 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' আমার চেক মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছি, কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের বই যখন পড়ি তখনই তাতে নতুন নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করি। তার কারণ কী?

কবি জসীম উদ্‌দীনের কাব্যরচনার বিষয় ভেবে আমার মনে হয় তাঁর আশ্চর্য কল্পনাশক্তির তিনটা প্রধান উৎস আছে।

প্রথমটা হল, বাংলা সাহিত্যের কাব্য-ঐতিহ্য—ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে tradition। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" থেকে আলাওল ও ভারতচন্দ্রের রচনা পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই বাংলা কবিগণ যে সকলে শুধু তাঁদের অন্তরের সুখ-দুঃখ অনুরাগ, ভালবাসা, বেদনা শ্রদ্ধা, কবিতা ও গান দিয়ে প্রকাশ করলেন তা নয়; নানা রকমের কাহিনী ও গল্প বানিয়ে কাব্যাকারে সৃষ্টি করলেন।

অবস্থাটা দেখে মনে হতে পারে দেশের পুরানো কাব্য-ঐতিহ্য একেবারে মৃত। শুধু মাঝে মাঝে যেমন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' বা 'পলাতকা'য় আমরা দেখতে পাই এই মরণাপন্ন ঐতিহ্যের নতুন জীবন দান করবার প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে কেন, পশ্চিম দেশের সাহিত্যেও প্রায় ঠিক এই রকমের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের চেক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। কয়েক শতাব্দী আগে নানা ধর্ম ও অধর্ম কাহিনী কাব্যাকারে রচিত হল। আধুনিক যুগে তা আর কেউ করে না ও যারা করতে চায় তাদের চেষ্টার কোনো ফল হয় না।

আমার মনে হয়, তাকে উপেক্ষা করা বড় অন্যায়। বিশেষত গ্রাম্যগান শুনে বা পড়ে আমার বারম্বার আশ্চর্য লাগে, ও সেইসব অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের প্রতি

একটা গভীর শ্রদ্ধা হৃদয়ে জাগে। কী সরল অথচ সুন্দরভাবে তারা তাদের নিজের ও তাদের প্রতিবেশীদের অনুভব ও ধারণা প্রকাশ করতে জানে! ধর্মের আদর্শ, বিচ্ছেদের শোক, ভালবাসার সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সবটা চমৎকার উপমা, চমৎকার গ্রাম্যালঙ্কার প্রয়োগ করে বর্ণনা করে।

কিন্তু তার সৌন্দর্যের জন্য শুধু নয়, অন্য কারণেও এই গ্রাম্য সাহিত্য ও পুঁথিকে জানা উচিত। তাতে আমরা বাংলা জনসাধারণের চিন্তাধারা ও রুচির একটা সত্যশীল ছবি পাই। পড়তে পড়তে দেখতে পাই যে-কোনো কারণেই হোক, গদ্যের চেয়ে কাব্য রচনার প্রতি বাংলা জনসাধারণের বেশি আকর্ষণ। তারাই পুরানো কাব্য-ঐতিহ্য রক্ষা করে, তাদেরই কবিগণ নানা জারিগান, গীতিকা, মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়ে দেয়। কাব্যের প্রতি অশিক্ষিত বাংলার গ্রাম্য লোকের অসীম ভালবাসা নিজের চোখে অনেকবার দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

কবি জসীম উদ্‌দীন পূর্ব পাকিস্তানের এইসব গ্রাম্য সাহিত্য ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন; লম্বা লম্বা বছর ধরে নিজেই গ্রাম্যগান সংগ্রহ করছিলেন। আমার মতে তাই হল তাঁর নিজের রচনার দ্বিতীয় উৎস। সারা দুনিয়াতে আমরা লোকসাহিত্যের নানা রকমের সংগ্রাহক দেখতে পাই, anthropologists ethsologists, musicologists ইত্যাদি। জসীম উদ্‌দীন এইরকমে গ্রাম্যগান সংগ্রহ করেননি; উনি কবি; বাল্যকাল থেকে কবি শিষ্যের মতো সবচেয়ে বড় কবির পায়ে বসেছিলেন, যার নাম হচ্ছে জনসাধারণ। আমার বিশ্বাস ওর থেকে উনি তাঁর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ ; সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা' ইত্যাদি বইগুলির বাইরের রূপ পেয়েছেন, গ্রাম্য কবিদের সঙ্গে একই অতল সৌন্দর্যের সাগর থেকে পান করতে শিখেছেন। তাই গ্রাম্যগান নকল করেন তা মনে করলে একেবারে ভুল হবে। লোকসাহিত্যের উপমা নিজের কবিত্বশক্তি দিয়ে বদলিয়ে তিনি তাদের নতুন মানে সৃষ্টি করেন।

তাঁর কবি-কল্পনার যে তিনটা উৎস উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে তৃতীয়টা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— জনসাধারণের প্রতি জসীম উদ্‌দীনের অপরিসীম মমতা ও সমবেদনাবোধ যাকে বলা যায় poetic humanism। পূর্ব ইউরোপের দেশে অনেক কবি ও লেখক এখন জনসাধারণের কাছাকাছি হতে চেষ্টা করে; তারা বিশ্বাস করে জনসাধারণই হল প্রত্যেক জাতির বুনিয়াদ। এরকমের rationalistic approach জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-রচনায় খোঁজ করা বাহুল্য। উনি তো গ্রামের মানুষ, মাটির মানুষ, বাংলা জনসাধারণের সঙ্গে অসংখ্য বন্ধন দিয়ে বাঁধা কবি।

তাদের সুখ দুঃখ বুঝতে পারেন, তাদের আনন্দ বেদনা মুখরিত করতে জানেন। তাই তাঁর বইগুলির নায়ক ও বিশেষ করে নায়িকা জীবিত লোক, জীবিত চরিত্র।

কবি জসীম উদ্‌দীনের 'সকিনা' ঠিক এই জাতীয় একটি কাব্যোপন্যাস। সকিনা, যার "রূপই তার শত্রু হইল" সেই মেয়ের সুন্দর কাহিনী একদমেই পড়ে ফেললাম; তারপর আর একবার পড়তে লাগলাম—কত সুন্দর ছত্র তাতে আবার পেলাম।

আমার মনে হয় জসীম উদ্‌দীনের কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যের বড় দান।

নক্সী-কাঁথার মাঠ